কেউ যদি অন্যায় করে আমাদের দেশে তার বিচার হয়

বাংলাদেশের উপর যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার কোনও যৌক্তিকতা নেই বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, ‘আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী কোন সংস্থা, সেটা র্যাব হোক, পুলিশ হোক বা অন্য যে কোনও সংস্থা হোক; তারা অন্যায় করলে আমাদের দেশে সেটার বিচার হয়। কেউ যদি কোনও অন্যায় করে, আমাদের দেশে তার বিচার হয়। এই বিচারে কেউ রেহাই পায় না। অনেক সময় তারা কোনও কাজ অতিরিক্ত করে, করতে পারে। কিন্তু করলে সেটা আমাদের দেশের আইনেই সেটার বিচার হচ্ছে। যেখানে এমন বিচার হচ্ছে, এমন ব্যবস্থা আছে; সেখানে এই স্যাংশনে কী কারণে?’

যুক্তরাষ্ট্র সফররত প্রধানমন্ত্রী ওয়াশিংটন ডিসি ভয়েস অব আমেরিকাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন। শনিবার এই সাক্ষাৎকার প্রচার করা হয়।

সাক্ষাৎকারে ভয়েস অব আমেরিকার সাংবাদিক শতরূপা বড়ুয়া প্রধানমন্ত্রীর কাছে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ বিষয়ে প্রশ্ন করেন। প্রধানমন্ত্রী তার জবাবে বলেন, ‘আমার এটাই প্রশ্ন— কথা নেই, বার্তা নেই; হঠাৎ ভিসা স্যাংশন দিতে চাচ্ছে কী কারণে? আর মানবাধিকারের কথা যদি বলে বা ভোটের অধিকারের কথা যদি বলে… আমরা, আওয়ামী লীগ; আমরাইতো এদেশের মানুষের ভোটের অধিকার নিয়ে সংগ্রাম করেছি। আমাদের কত মানুষ রক্ত দিয়েছে, এই ভোটের অধিকার আদায়ের জন্য।’

অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন যেন হয়, তার জন্য যতরকম সংস্কার দরকার, সেটা আওয়ামী লীগ করেছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আজ ছবিসহ ভোটার তালিকা, স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স, মানুষকে ভোটের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা…। ‘আমার ভোট আমি দেবো, যাকে খুশি তাকে দিবো’— এই স্লোগানও আমার দেওয়া। আমি এভাবে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছি। কারণ আমাদের দেশে বেশিরভাগ সময় স্বৈরশাসকরা দেশ শাসন করেছে। তাদের সময় সাধারণ মানুষের ভোট দিতে হয়নি। তারা ভোটের বাক্স ভরে নিয়ে ফলাফল ঘোষণা করে দিয়েছেন। এরই প্রতিবাদে আমরা আন্দোলন, সংগ্রাম করে আজ আমরা নির্বাচন সুষ্ঠু পরিবেশে নিয়ে আসতে পেরেছি। এখন মানুষ তার ভোটের অধিকার সম্পর্কে অনেক

সচেতন। সেটা আমরা করেছি।’

২০০৯ এ আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর যতগুলো নির্বাচন হয়েছে, জাতীয় কিংবা স্থানীয় সরকার নির্বাচন; প্রত্যেকটা সুষ্ঠুভাবে হয়েছে দাবি করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘এসব নির্বাচনে মানুষ তার ভোট দিয়েছে স্বতস্ফূর্তভাবে। এই নির্বাচনগুলো নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তোলার চেষ্টা করেছে, কিন্তু বাস্তবতাটা কী, বাংলাদেশের মানুষ তার ভোটের অধিকার নিয়ে সবসময় সচেতন। কেউ ভোট চুরি করলে তাদের ক্ষমতায় থাকতে দেয় না।’

উদাহরণ তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি খালেদা জিয়া ভোট চুরি করেছিলেন। সে কিন্তু দেড় মাসও টিকতে পারেনি। ওই বছরের ৩০ মার্চ তাকে জনগণের রুদ্র রোষে পড়ে পদত্যাগ বাধ্য হয়েছেন তিনি। আবার ২০০৬ সালে ১ কোটি ২৩ লাখ ভুয়া ভোটার দিয়ে ভোটার তালিকা করেছিল। সেই ভোটার তালিকা দিয়ে নির্বাচন করে সে যখন সরকার গঠনের ঘোষণা দিলো… এরপর জরুরি অবস্থা জারি করা হলো। সেই নির্বাচন বাতিল হয়ে গেলো। কাজেই আমাদের দেশের মানুষ কিন্তু এখন ভোট সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। কাজেই একটা নির্বাচন অবস্থা, সুষ্ঠু হবে— এটা তো আমাদেরই দাবি ছিল। এবং আন্দোলন করে আমরাই সেটা প্রতিষ্ঠিত করেছি। তো আজ তারা স্যাংশন দিচ্ছে, আরও দেবে; দিতে পারে। এটা তাদের ইচ্ছা। কিন্তু আমাদের দেশের মানুষের যে অধিকার; তাদের ভোটের অধিকার, ভাতের অধিকার, তাদের বেঁচে থাকার অধিকার, তাদের শিক্ষা-দীক্ষার অধিকারসহ সব মৌলিক অধিকার আমরা নিশ্চিত করেছি।

‘রাজনৈতিক মামলায়’ সাজাপ্রাপ্ত প্রধান বিরোধী দলের অসুস্থ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর অনুমোদন দেওয়া প্রসঙ্গে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বলেন, এ জন্য তাকে তার সাজা বর্তমানে স্থগিত করে বাড়িতে থাকার ও দেশে চিকিৎসা নেওয়ার অনুমোদন যে এক সরকারি আদেশে বর্তমানে কার্যকর রয়েছে তা বাতিল করে, জেলে গিয়ে আদালতের কাছে আবেদন করতে হবে।

২০০৯ সাল থেকে ২০২৩ সাল, বাংলাদেশ কিন্তু বদলে যাওয়া বাংলাদেশ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘এখন আর বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ নেই, এখন মানুষের সেরকম হাহাকার নেই, এমনকি আমাদের যে বেকারত্ব সেটাও কিন্তু কমিয়ে এখন মাত্র তিন শতাংশ। সেটাও তারা কাজ করে খেতে পারেন।’
প্রধানমন্ত্রী আরও দাবি করেন, বাংলাদেশেই এখন অনেক কর্মসংস্থানের

সুযোগ তৈরি হয়েছে, তাই ভিসা স্যাংশন এর ফলে যদি (বাংলাদেশিরা) আমেরিকায় আসতে না পারে, আসবে না। তাতে কিছু যায় আসে না।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সাক্ষাৎকারে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের অফিস, আমেনেস্টি ইন্টারন্যাশনালসহ দেশি বিদেশি মানবাধিকার সংগঠনগুলো তার সরকারের আমলে গত ১৫ বছরে গুমের ঘটনার যে অভিযোগগুলো করেছে, সে ব্যাপারে তার সরকারের ব্যাখ্যা তুলে ধরেন। সাক্ষাৎকারে তিনি সদ্য পাস হওয়া সাইবার নিরাপত্তা আইনের যে ধারাগুলো নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে তারও জবাব দেন।

৩৫ মিনিটের এ সাক্ষাৎকারে তিনি বাংলাদেশে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিশ্চিত করতে আগামী জাতীয় পার্লামেন্ট নির্বাচন একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে করার জন্য বিরোধীদলগুলোর দাবিকে নাকচ করে দিয়ে বলেন, এ ব্যবস্থায় ফেরত যাবার কোনও সুযোগ নেই।

বিরোধীদলগুলোর বিশেষ করে প্রধান বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে লাখ লাখ মামলা দায়ের প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, অপরাধ করলে মামলা হবে।

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে

এইতো এক যুগেরও আগের কথা, উন্নয়নের তলানিতে ডুবে ছিলো এই দেশ। লুটতরাজ ও দুর্নীতিবাজরা দেশে দুঃশাসন প্রতিষ্ঠা করে দেশকে পিছিয়ে নিতে তৎপর ছিলো। চেয়েছিলো অবৈধ পথে ক্ষমতায় বসতে কিন্তু ২০০৯ সালে জনগনের ভোটের রায়ে অশুভ শক্তির সকল অপচেষ্টা বিফলে যায়। সফল রাষ্ট্রনায়ক হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ২য় মেয়াদে এই দেশের মানুষ অভিভাবকের আসনে বসান। সেই থেকে রচিত হতে থাকে উন্নয়নের মহাকাব্য।

সুপরিকল্পিতভাবে দেশের সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করতে

থাকেন তিনি। গ্রাম থেকে শহর বাংলাদেশের সকল স্থানে উন্নয়নের ছোয়া লাগা শুরু হয়। দেশের মানুষকে এখন আর আদিম যুগের মতো পরনির্ভরশীল থাকতে হয় না। ডিজিটাল বাংলাদেশ আমাদেরকে আত্মনির্ভরশীল হতে সহায়তা করেছে, প্রযুক্তি হয়েছে সহজলভ্য।

সকল উন্নয়ন ও প্রযুক্তির বিস্তারের পর তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের। ইতিমধ্যে এর সফল বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ। সরকারের সদিচ্ছার ন্যায় দেশের সকল শ্রেণী পেশার মানুষদেরও এগিয়ে আসতে হবে। বাংলাদেশ আমাদের সবার। দেশ স্মার্ট হলে এ জাতি স্মার্ট হবে। তাই সরকারকে সর্বোচ্চ সহযোগীতা করতে হবে সকলের।

স্মার্ট বাংলাদেশ হবে আমাদের সকলের একটি প্রতিশ্রুতি ও শ্লোগান যা ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরের পরিকল্পনা। স্মার্ট বাংলাদেশ’ গড়ার চারটি ভিত্তি রয়েছে। স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সমাজ। স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণে এ চারটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করে অগ্রসর হলে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরের কোনো অবশিষ্ট থাকবে না। স্মার্ট নাগরিক ও স্মার্ট সরকার এর মাধ্যমে সব সেবা এবং মাধ্যম ডিজিটালে রূপান্তরিত হবে। আর স্মার্ট সমাজ ও স্মার্ট অর্থনীতি প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করলে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠন এবং ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

‘স্মার্ট বাংলাদেশ হবে সাশ্রয়ী, টেকসই, জ্ঞানভিত্তিক, বুদ্ধিদীপ্ত ও উদ্ভাবনী। এককথায় সব কাজই হবে স্মার্ট। যেমন স্মার্ট শহর ও স্মার্ট গ্রাম বাস্তবায়নের জন্য স্মার্ট স্বাস্থ্যসেবা, স্মার্ট পরিবহন, স্মার্ট ইউটিলিটিজ, নগর প্রশাসন, জননিরাপত্তা, কৃষি, ইন্টারনেট সংযোগ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। অনলাইনে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এক শিক্ষার্থী, এক ল্যাপটপ, এক স্বপ্নের উদ্যোগ নেয়ার কথা বলা হয়েছে। এর আওতায় সব ডিজিটাল সেবা কেন্দ্রীয়ভাবে সমন্বিত ক্লাউডের আওতায় নিয়ে আসা হবে। ইতোমধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের নাম পরিবর্তন করে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স’ গঠন করেছে বাংলাদেশ সরকার। ‘স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স’ এর নয়টি কার্যপরিধিও সুস্পষ্ট করেছে সরকার যথা- ১. অগ্রসরমান তথ্যপ্রযুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান; ২। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও আর্থিক খাতের কার্যক্রম স্মার্ট পদ্ধতিতে

রূপান্তরের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে দিক নির্দেশনা প্রদান; ৩. স্মার্ট ও সর্বত্র বিরাজমান সরকার গড়ে তোলার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক, বাণিজ্যিক ও বৈজ্ঞানিক পরিমন্ডলে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক বিধি-বিধান প্রণয়নে দিক নির্দেশনা প্রদান; ৪. বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ উৎক্ষেপণে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান; ৫. এজেন্সি ফর নলেজ অন এরানোটিক্যাল অ্যান্ড স্পেস হরাইজন (আকাশ) প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান; ৬. ব্লেন্ডেড এডুকেশন মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং ফাইভজি সেবা চালু পরবর্তী সময়ে ব্যান্ডউইথের চাহিদা বিবেচনায় চতুর্থ সাবমেরিন ক্যাবলে সংযোগের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান; ৭. রপ্তানি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মেড ইন বাংলাদেশ পলিসি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সময়াবদ্ধ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে দিক নির্দেশনা প্রদান; ৮. আর্থিক খাতের ডিজিটালাইজেশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান এবং ৯. স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ (স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট সোসাইটি, স্মার্ট ইকোনমি এবং স্মার্ট গর্ভমেন্ট) বাস্তবায়নে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে দিক নির্দেশনা প্রদান।

স্মার্ট বাংলাদেশে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও আর্থিক খাতের কার্যক্রম স্মার্ট পদ্ধতিতে রূপান্তর করবে আওয়ামী লীগ সরকার। স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নের জন্য সরকারি ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন এবং এর উন্নয়নে একটি দক্ষ ও স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। সরকারি বিভিন্ন সেবা কার্যক্রম ডিজিটাইজেশন করা হবে। সুতারং সরকার আগামী ২০৪১ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে আদর্শগত এমন রূপান্তর ঘটাবে যেখানে সকল সেবার ভিড়ে না হারিয়ে নাগরিকগণ নিজের প্রয়োজনীয় সেবা সহজে খুঁজে পাবেন; সেবা গ্রহিতার দায় নয় সেবা প্রদানকারীর দায়কে শক্তভাবে দেখা হবে; সরবরাহ কেন্দ্রিক থেকে চাহিদা কেন্দ্রিক সার্ভিসের যোগান হবে; নাগরিকগণকে এখন ডিজিটাল মাধ্যমেও নানান চ্যানেলে (অ্যাপ, ওয়েব, কল সেন্টার ইত্যাদি নানা প্লাটফর্ম ব্যবহার করতে হয়) সেবা গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু স্মার্ট বাংলাদেশে একটি মাত্র প্লাটফর্ম থেকে নাগরিকগণ সকল চাহিত সেবা পাবেন। নানান পরিচয় নম্বরের (যেমন এনআইডি, পাসপোর্ট, জন্ম নিবন্ধন নম্বর ইত্যাদি) পরিবর্তে একটি পরিচয় নম্বর (ইউনিক আইডি) দিয়ে সকল কার্যক্রম সম্পাদন এবং সরকারি সেবা প্রদানকে দেখা হবে সেবা গ্রহিতার চোখে, সেবা দাতার চোখে নয়।

পেমেন্ট প্ল্যাটফরম ‘একপে’-তে বিভিন্ন ধরনের করতে নতুন ৮টি আর্থিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের নতুন পেমেন্ট চ্যানেল যুক্তকরণ।

সর্বোপরি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যোগ্য কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এবং আমাদের সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় এই দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাবে।

লেখক:কোষাধ্যক্ষ, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

শেখ হাসিনা: মৃত্যুঞ্জয়ী ধ্রুবতারার উপাখ্যান

একের পর এক আক্রমণ, গ্রেনেড হামলা। অসংখ্য বার হত্যাচেষ্টা। বিশ্বের কোন রাজনীতিবীদ এতোবার হত্যা আক্রমণের শিকার হন নি। রাজনৈতিক জীবনে ২১ বার মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে এসেছেন শেখ হাসিনা। প্রতিটি হামলাতেই অনেক মানুষ নিহত হয়েছেন, আহতের সংখ্যা অগণিত।

১৯৮১ থেকে ১৯৯১ সাল, এই দশ বছরে শেখ হাসিনাকে মোট তিনবার হত্যার চেষ্টা করা হয়। খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে প্রথম সরকার গঠনের পর আরো তিনবার শেখ হাসিনার উপর হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করা হয়। এমনকি ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সালে ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়েও হত্যাচেষ্টা চলে। ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়েও শেখ হাসিনাই মূল টার্গেট বিরোধী শক্তির।
১৯৮৮ সালে এরশাদ সরকারের আমলে চট্টগ্রামের লালদীঘি দিয়ে শুরু হয় শেখ হাসিনার উপর হত্যার উদ্দেশ্যে প্রথম আক্রমণ । ১৯৮৮ সালে ২৪ই জানুয়ারি পতেঙ্গা বিমানবন্দরে নেমে একটি সন্ত্রাস বিরোধী সমাবেশে যোগ দিতে লালদীঘিতে যাচ্ছিলেন শেখ হাসিনা। পথে সসস্ত্র হামলা, নির্বিচারে গুলি, শেখ হাসিনাকে মানববর্ম তৈরি করে রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় ৯জন, নিহতের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ২৪ এ। আহত হন দুই শতাধিক মানুষ। এ হত্যাকান্ডটি পরবর্তীতে চট্টগ্রাম গণহত্যা নামে পরিচিতি পায়। সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার ছিলো তৎকালীন মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার মির্জা রকিবুল হুদার নির্দেশে ওই

কারাদণ্ড। এছাড়া ১৩ জনকে ১০ বছর করে কারাদণ্ড হয়েছে।

১৯৯৫ সালের ৭ই মার্চ রাসেল স্কয়ার সমাবেশে ভাষণ দেয়াকালে শেখ হাসিনার ওপর হামলা চালানো হয়। সশস্ত্র এ হামলা থেকে বাঁচাতে নেতাকর্মীরা শেখ হাসিনাকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়। ১৯৯৬ সালের ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের স্মরণে বক্তৃতাকালে হঠাৎ করে এক মাইক্রোবাস থেকে শেখ হাসিনাকে লক্ষ্য করে গুলি ও বোমা হামলা করা হয় । এতে কমপক্ষে ২০ জন নেতাকর্মী আহত হয়। গণতান্ত্রিক সরকারকে উৎখাত এবং শেখ হাসিনা ও তাঁর পরিবারের সদস্যসহ একত্রিশ জনকে হত্যার একটি ই-মেইল ১৯৯৯ সালের ১২ জুলাই ফাঁস হয়। ইমেইলের প্রেরক ছিলেন ইন্টার এশিয়া টিভির মালিক সৈয়দ চৌধুরী।

হরকাতুল জিহাদের বড় আক্রমণটি ছিল শেখ হাসিনার নিজের নির্বাচনী এলাকা গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায়। হুজির অন্যতম শীর্ষ নেতা মুফতি হান্নানের জবানবন্দী অনুযায়ী ২০০০ সালের জুলাই মাসে হুজির কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে শেখ হাসিনাকে হত্যার সিদ্ধান্ত হয়। ২০ জুলাই কোটালীপাড়ায় শেখ হাসিনার সমাবেশস্থলে ৭৬ কেজি ও হেলিপ্যাডের কাছে ৪৩ কেজির দু’টি শক্তিশালী বোমা পুঁতে রাখা হয়। তবে সমাবেশের আগে পুলিশ তা উদ্ধার করে ফেলে। ২০০১ সালে মুফতি হান্নানসহ আসামিদের বিরুদ্ধে সিআইডি চার্জশীট দিলেও বিএনপি আমলে এই মামলার অগ্রগতি আর হয়নি। পরবর্তীতে ২০১০ সালে মামলা ঢাকার ২ নং দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তর করা হয়। ২০১৭ সালের ২০ আগস্ট এই মামলার রায় আসে। এই মামলায় ১০ জনকে ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেয়া হয়। রায়ের মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন মোহাম্মদ মহিবুল্লাহ, মুন্সী ইব্রাহীম, মাহমুদ আজহার, রাশেদ ড্রাইভার, শাহনেওয়াজ, মোঃ ইউসুফ, মোঃ লোকমান, শেখ এনামুল, মোঃ মিজানুর। এই মামলার অন্যতম আসামী মুফতি হান্নানের অন্য মামলায় ফাঁসি হওয়ায় তাকে এই মামলা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। সঙ্গে ৯ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে দেয়া হয়েছে কারাদণ্ড। তবে উচ্চ আদালতে এই মামলার মীমাংসা এখনও হয়নি। ফলে এখন পর্যন্ত দণ্ড কার্যকর করা সম্ভব হয় নি।

২০০১ সালের ৩০ মে খুলনায় রূপসা সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার পরিকল্পনা করেছিলো হুজি-বি। অনুষ্ঠানের তিন দিন আগেই ২৭ মে সেতুর কাছাকাছি রূপসা নদীতে দু’টি ইঞ্জিনচালিত নৌকায় ১৫ জঙ্গি ধরা পড়ে যাওয়ায় সেটিও আর সফল হয়নি। এই ১৫ জনের একজন মাসুম বিল্লাহ ওরফে মুফতি মঈন পরবর্তীতে ঢাকায় ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলায় অংশ নিয়েছিল। ২০০১

সালে। ২০০৮ এ অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসলে অধিকতর তদন্তের পর ২০১১ সালে সম্পূরক অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়। ২০১২ সাল থেকে আদালতে সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয় মামলার। যুক্তিতর্ক শুরু হয় ২০১৭ সালে, আর ২০১৮ সালের ১০ অক্টোবর এই মামলার রায় ঘোষণা করা হয়। বহুল আলোচিত এই মামলার রায়ে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় ১৯ জনকে। বিচারের রায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ১৯ জনের অন্যতম বিএনপি আমলের সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর, সাবেক উপমন্ত্রী আব্দুস সালাম পিন্টু, ডিজিএফআই এর সাবেক মহাপরিচালক অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল রেজ্জাকুল হায়দার চৌধুরী ও এনএসআই এর সাবেক মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আব্দুর রহিম। তারেক রহমান ও হারিছ চৌধুরীসহ ১৭ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয় আদালত।

ওয়ান-ইলেভেন পরবর্তী সময়ে কারাবন্দী থাকা অবস্থায় খাবারে বিষ প্রয়োগ করে শেখ হাসিনাকে হত্যার চেষ্টা করা হয়। ঐ খাবার খেয়ে তাঁর চোখ-মুখ ফুলে গিয়েছিলো এবং তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ২০০৯ সালের ২৭ জুন রাজধানীতে এক আলোচনা সভায় আওয়ামী লীগের তৎকালীন সংসদ উপনেতা সৈয়দ সাজেদা চৌধুরী এ তথ্যের নিশ্চয়তা দিয়ে বিস্তারিত বক্তব্য দেন। ১১ মাস কারাগারে থাকার পর ২০০৮ সালের ১১ জুন মুক্তি পান বঙ্গকন্যা শেখ হাসিনা।

শ্রীলঙ্কার একটি সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী চক্র সুইসাইড স্কোয়াড গঠন করেছিল শেখ হাসিনাকে হত্যার জন্য। ২০১১ সালের ডিসেম্বরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত ও হত্যা করার লক্ষ্যে একটি সামরিক অভ্যুত্থান চেষ্টার পরিকল্পনা করা হয়েছিল, যা পরে ব্যর্থ হয়ে যায়। ২০১৪ সালের শেষদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার ষড়যন্ত্র ও অভ্যুত্থানের পরিকল্পনার কথা স্বীকার করেন পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান বিস্ফোরণের ঘটনায় গ্রেফতার জঙ্গি শাহানুর আলম ওরফে ডাক্তার

২০১৫ সালের ৭ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যাওয়ার পথে কারওরান বাজারে তার গাড়িবহরে বোমা হামলা চালানোর চেষ্টা চালায় জামা’আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ জঙ্গিগোষ্ঠী। ২০১৬ সালের জুনে শেখ হাসিনাকে বহনকারী বিমান হযরত শাহজালাল বিমানবন্দরের রানওয়েতে ধাতব পদার্থের উপস্থিতি থাকায় নামতে গিয়ে আবার ওপরে উঠে যায়। ধারণা করা হয়েছিল ওই বস্তুর আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হবে তার বিমান। ২০১৬ সালের ২৭ নভেম্বর সরকারি সফরে হাঙ্গেরি যাওয়ার পথে বিমানের নাট ঢিল করে রাখা হয়েছিল, যদিও বিষয়টিকে কিছুটা গোপনে রাখা

হয়েছিল তখন কিন্তু তাকে হত্যার পরিকল্পনায় এমনটা হয়েছিল বলে ধারণা।

২০১৭ সালেও শোকের মাসে ধানমন্ডি-৩২ নম্বরে শ্রদ্ধা নিবেদনের সময় প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার পরিকল্পনা করেছিল জঙ্গিরা। বারবার হামলার পরও বুলেট-বোমা আর কূটচালের শত বাধা ডিঙিয়ে যিনি বাংলাদেশকে টেনে তুলছেন খাদের কিনার থেকে সমৃদ্ধির পথে।

কোন সার্বভৌম রাষ্ট্রের ওপর কেউ নিষেধাজ্ঞা দিতে পারে না

বাংলাদেশের নির্বাচন ‘অবাধ ও সুষ্ঠু’ করার লক্ষ্যে কেউ যেন বিঘ্ন সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র ভিসানীতির আওতায় ফেলেছে বাংলাদেশকে। যদি এমন কেউ ভিসার জন্য আবেদন করে যিনি বাংলাদেশের নির্বাচনকে বাধাগ্রস্থ করতে চায় বলে প্রমাণিত হয়, তবে তিনি ভিসা নাও পেতে পারেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের ভালোর জন্য এই উদ্যোগ নিয়েছে। তবে একথা না বলে উপায় থাকে না যে- যুক্তরাষ্ট্র অন্যদেশের স্বার্থ সংরক্ষণ করে এমন আমার জানা নেই। তারা যেকোন সিদ্ধান্ত নেয় নিজের স্বার্থ রক্ষায়। এই প্রক্রিয়ায় তাদের অন্যতম একটি অস্ত্র হলো ‘স্যাংশন’। যেকোন উদ্ভুত পরিস্থিতিতে কোন দেশকে শাস্তি দিতে হলে, বা যুক্তরাষ্ট্র কাউকে শাস্তি দেবে মনে করলে তখন এই অস্ত্র প্রয়োগ করে।

প্রশ্ন হলো, এইটা কোন রাষ্ট্র কখন পারে? বা আদৌ তারা কীভাবে পারে? একক কোন দেশ, অন্য কোন সার্বভৌম দেশের ওপর স্যাংশন দেয়া আইনভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থার বিরুদ্ধে কাজ করে। তথাকথিত চিন্তা হলো- বিশ্বের সব দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে একটি সংস্থা কাজ করে। সেটি হলো জাতিসংঘ। তাকে পাশ কাটিয়ে কোন একটা দেশ অপর দেশের ওপর যখন তাদের ইচ্ছা চাপিয়ে দিতে চায়, তখন সে তার অস্ত্র হিসেবে স্যাংশনকে ব্যবহার করে। যুক্তরাষ্ট্র যখন সেই সিদ্ধান্ত নিতে চায় তখন সে খেয়াল করে ওই দেশের সঙ্গে মেজরিটি কান্ট্রি আছে

কিনা? সেসব বিচার করে আমেরিকা সিদ্ধান্ত নেয়।

আমি মনে করি, বর্তমানে স্যংশনের নামে যেটা ব্যবহার করা হচ্ছে, সেটা আসলে জনগনকে শাস্তি দিচ্ছে। বাংলাদেশের সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে আপনি স্যাংশন আরোপের কথা বলছেন বা বাস্তবায়ন করছেন ঠিকই, কিন্তু আসলে সেটা যখন করছেন তখন এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে কস্ট দেওয়া হচ্ছে। ভুলে গেলে চলবে না, বাংলাদেশের মানুষের কস্টে থাকার অভিজ্ঞতা আছে। আর এই দেশের মানুষের এও জানা আছে যে, ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে যে স্বাধীনতা অর্জন করেছিলো তা আমেরিকার ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

আমেরিকা আসলে কেন এমন পরিস্থিতি তৈরী করলো? এবার একটু পিছনের দিকে ফিরতে হবে। মুক্তিযুদ্ধে তারা বাংলাদেশের পক্ষ নেয়নি। শুধু তাই নয়, একটি যুদ্ধোত্তর দেশকে সামনে এগোতে নানা বাধা সৃষ্টি করেছিল। নিজের স্বাধীন দেশের জন্যে, বঙ্গবন্ধু যখন কিউবাতে গিয়ে তাঁর চটের বস্তা নিয়ে কাজ করতে চাইলেন তখন আমেরিকা বাধ সেধেছিলো। সেসময় তারা খাদ্য অনুদান দিতো, সেটি বন্ধ করে দেয়ায় বাংলাদেশে চরম খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়। অনুদান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সেই মুহূর্তে খাদ্য ঘাটতি পূরণ করতে না পারায় খাদ্য সংকটে পড়েছিলো এই দেশ। সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়েছিল শ্রমজীবী মানুষ। লেখার শুরুতে যেটা বলছিলাম, আসলে শাস্তিটা পায় সাধারণ মানুষ।

অন্যান্য দেশের উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। ভেনেজুয়েলাতে তাদের স্যাংশনের কারণে ৪০ হাজার শিশু মারা গিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর একক সিদ্ধান্তে মারা গেলো ৪০ হাজার শিশু! এমন পরিস্থিতি যখন শুধু একটি দেশের ইচ্ছায় হয়, তখন কোন সম্মিলিত বিশ্বব্যবস্থা তা মানতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে এই স্যাংশন অস্ত্র যেভাবে কাজে লাগাতে চাইছে, সেটা আগামীদিনে কতটা কাজে লাগবে তা নিয়ে আমার শঙ্কা রয়েছে। কারণ স্যাংশনে পড়া অনেক দেশ সেটা ভেঙে ফেলতে চাইছে। যেমন ধরা যাক, ইউক্রেনের জন্য রাশিয়াকে যে স্যংশন তারা দিয়েছে, তা কি রাশিয়া মানছে? কিংবা ধরা যাক, উগান্ডা কিংবা নাইজেরিয়ার কথা।

ঠিক একইভাবে, বাংলাদেশে তারা এখন অবাধ সুস্ঠু নির্বাচনের কারণ দেখিয়ে স্যংশনের হুমকি দিল। প্রশ্ন হলো, তারা ‘অবাধ ও সুষ্ঠু’ নির্বাচনের কথা বলছে বটে, কিন্তু অবাধ পরিবেশ তৈরী করছে কি? বরং দেখা যাচ্ছে, যারা আমেরিকার ইচ্ছের বিরুদ্ধে যাচ্ছে, তাদের বশে আনার উপায় হিসেবে স্যাংশন দিচ্ছে। তারা কার ওপর হুমকি দেবে, সেটা

নিশ্চিত বোঝা কঠিন হয়ে যাচ্ছে কারণ, নির্বাচনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমন অনেকের ভিসাও যে আমেরিকা দেয়নি সেই উদাহরণও আছে।

আরেকটি অমীমাংসিত প্রশ্ন হলো, কারা কী করছে যুক্তরাষ্ট্র কোথা থেকে সে তথ্য নিচ্ছে? সেই তথ্য একপেশে, না গ্রহণযোগ্য সেই বিবেচনা কে করবে? একজন তথাকথিত মানবাধিকারকর্মী আদিদুলের আইনের পথে বিচার হলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের মাথা ব্যাথার কারণ হয় এবং তার পক্ষে সরব অবস্থান নেয়। কিন্তু সেই লোক যে ৬১ লাশের কথা বলে মিথ্যাচার করলো এবং সেই মিথ্যাচার যে একটা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরী করলো, অরাজকতার চেষ্টা হলো, সেটা উল্লেখ না করে, বিবেচনায় না নিয়ে, প্রকারন্তরে সমর্থন দিলো! সেই বিষয়টা অন্ধকারে রেখেই কী বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি মূল্যায়ন হবে?

আসলে খোদ যুক্তরাষ্ট্র দেখতে পাচ্ছে যে এই স্যাংশন নিয়ে রাশিয়া, ইরান, উত্তর কোরিয়া ভাল আছে। মার্কিন নিয়ন্ত্রিত যে অর্থব্যবস্থা, তার বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত গড়ে উঠতে শুরু করেছে। ফলে এধরনের অস্ত্রের ব্যবহার, মার্কিনবিরোধী জোট তৈরীতে সহায়ক হবে। এই বোধ আমেরিকার থাকতে হবে। যদিও এ নিয়ে আমি তাদের উপদেশ দিতে চাই না। শুধু বলতে চাই, একপেশে তথ্যের ওপর ভিত্তি করে, কোন বিশেষ গোষ্ঠীকে সুবিধা দেবার জন্য স্যাংশনের মত কোন উদ্যোগ গ্রহণযোগ্য না। বাংলাদেশের জন্যে ভিসানীতি ঘোষণার পর দেখা গেছে, একপক্ষ আনন্দ নিয়ে উগ্রীব হয়ে আছে। এতেই বোঝা যায় এটি একটি রাজনীতি বিভাজন প্রক্রিয়া। যে কারণে এক পক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে জেনে খুশি হয়ে যাচ্ছে অন্যপক্ষ।

সেটা কি অবাধ নিরপেক্ষ পরিস্থিতি সৃষ্টিতে সহায়ক? এই পরিস্থিতি সংঘাতের কারণ হতে পারে। সেই দায় কে নেবে? ভুলে গেলে চলবে না যে, আরেক দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার কারণে কোন সংঘাত হলে, এর দায় তাদের নিতে হবে। স্যাংশন বিষয়ে ঘোষণা আসার পরে বাংলাদেশে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত পিটার হাস আবার সুনির্দিষ্ট করে বলছেন, এরমধ্যে গণমাধ্যমও পড়বে। আবার এরপর স্টেট ডিপার্টমেন্ট বলছে, গণমাধ্যম পড়বে এমনটা এখনও না। এ ধরনের আলাপ তোলা, কোন রাষ্ট্রদূতের জন্যে কতটা কূটনৈতিক শিষ্টাচার? এই প্রশ্ন আমরা এখন তুলতেই পারি। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কথা বলার এখতিয়ার বিদেশি রাষ্ট্রের নেই। কিন্তু তারপরেও তারা এটা করছে, কেনো? এক কথায় এর জবাব হতে পারে, তারা এটা করছে শক্তি দেখানোর জন্যে।
তাদের শক্তি দেখানোর আরও একটি উদাহরণ আছে। সেটা হচ্ছে, পিটার হাস আরও বলেছেন, তারা

বাংলাদেশের বিচার বিভাগ পযবেক্ষণ করবে। কী অদ্ভুত! তারা কি জানে না, বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা স্বাধীন? আপনি বিচারককে কীভাবে পযবেক্ষণ করবেন? তিনিতো কাজ করেন আইনের বিধিতে। বাংলাদেশ চলবে বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র বা সংবিধানে। আমেরিকার নিয়মে তো চলবে না। পর্যবেক্ষণের মতো বিষয়গুলো সামনে এনে এরা এসব প্রতিষ্ঠানে রিতীমত বিব্রতকর পরিস্থিতি তৈরী করতে চাচ্ছে।

এখন আমাদের অবস্থান কী হবে, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং সে অনুযায়ী অ্যাক্ট করা দরকার। সত্যিকথা বলতে, আমেরিকা মনে করে ভারত মহাসাগরে তার অবস্থান শক্ত করতে হলে বাংলাদেশকে তার লাগবে। কিন্তু বাংলাদেশের বৈদেশিক সম্পর্ক ভারসাম্যপূর্ণ, পররাষ্ট্রনীতি অনুযায়ী সে সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব রক্ষার কথা বলে। এখন সেটা ভাঙতে চাইলে বাংলাদেশকে নানারকম চাপ দেয়ার বিকল্প নেই। এখন এই অবস্থা বিবেচনা করে করণীয় ঠিক করাটা বাংলাদেশের জন্যে জরুরি।
লেখক: নিরাপত্তা বিশ্লেষক।

বঙ্গবন্ধুর তনয়ার আমলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অন্যতম আগ্রহ ও অগ্রাধিকারের জায়গা ছিল শিক্ষা খাত। স্বাধীনতার পরপরই দেশের ভঙ্গুর শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে নানা উদ্যোগ নেন তিনি। অল্প সময়ের মধ্যেই প্রাথমিক শিক্ষার জাতীয়করণ, সংবিধানে শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা, শিক্ষা কমিশন গঠন ও বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রতিষ্ঠাসহ শিক্ষার উন্নয়নে যুগান্তকারী বেশকিছু কর্মসূচি নেন বঙ্গবন্ধু। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তার তনয়া জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকারও সবসময় শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে দেখেছেন। বঙ্গবন্ধুর মতো আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীও শিক্ষায় ব্যয়কে বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করেন।

বছরগুলোয় দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মানেও বেশ উন্নতি ঘটেছে। বর্তমানে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেশন জট প্রায় শূন্যের কোঠায়। উচ্চশিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকল্পে বর্তমান সরকার বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গড়ে তুলেছে। বিশ^বিদ্যালয়গুলোয় মানসম্মত শিক্ষা ও গবেষণা নিশ্চিত করতে ২০০৯ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্পের (হেকেপ) সফল বাস্তবায়ন করে সরকার। বর্তমানে হায়ার এডুকেশন অ্যাক্সেলেরেশন অ্যান্ড ট্রান্সফরমেশন (হিট) শীর্ষক আরো একটি প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন। বিশেষ বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের পাশাপাশি সরকার ধারাবাহিকভাবে গবেষণা খাতে বরাদ্দ বাড়াচ্ছে।

২০০৯-২০১০ অর্থবছরে গবেষণা খাতে সরকারের বরাদ্দ ছিল মাত্র ১ কোটি ৫৭ লাখ টাকা। আর ২০২৩-২৪ অর্থবছরে উচ্চশিক্ষায় গবেষণার জন্য সরকার ১৭৪ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়। শিক্ষা ও গবেষণার মান বাড়ায় বৈশি^ক র্যাংকিংয়েও দেশের বিশ^বিদ্যালয়গুলোর অবস্থান পোক্ত হচ্ছে। গবেষণা, উদ্ভাবন ও সমাজের ওপর প্রভাব—বিজ্ঞান গবেষণায় এ তিনটি বিষয়কে ভিত্তি ধরে শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের তালিকা করে স্পেনের সিমাগো ল্যাব ও যুক্তরাষ্ট্রের স্কপাস। সিমাগো ইনস্টিটিউশনস র্যাংকিংস (এসআইআর)-এ ২০০৯ সালে বাংলাদেশ থেকে জায়গা পায় মাত্র ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়। আর ২০২৩ সালে এসে সিমাগো-স্কপাসের র্যাংকিংয়ে জায়গা পাওয়াদের তালিকায় বাংলাদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৮-এ।

উচ্চশিক্ষার পাশাপাশি উচ্চ মাধ্যমিক, মাধ্যমিক, প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক ধাপের শিক্ষার বেশ প্রসার ঘটেছে আওয়ামী লীগ সরকারের হাত ধরে। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশব্যাপী প্রাথমিক বিদ্যালয় অবকাঠামোর চিত্র বদলে ফেলা হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় শ্রেণিকক্ষ নির্মাণের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের অধ্যাধুনিক ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সম্প্রতি প্রচলিত পদ্ধতির শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল সংস্কার আনতেই নতুন শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। এ পরিবর্তনের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে আমাদের শিক্ষার্থীরা। শত বছর ধরে আমাদের মুখস্থনির্ভর শিক্ষাপদ্ধতি চলে আসছিল। পুরনো ধারার সে পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের চিন্তার সুযোগ ছিল খুবই সীমিত। নির্দিষ্ট কিছু বইয়ের নির্ধারিত অধ্যায় বা অংশ পড়ে পরীক্ষার খাতায় গৎবাঁধা কিছু নিয়েমে তা উগড়ে দেয়া হতো। নম্বরমূখী ওই ব্যবস্থায় শেখার সুযোগ ছিল অনেক কম। নতুন শিক্ষাক্রমে পুরনো সে পদ্ধতি ভেঙ্গে সম্পূর্ণ নতুন ধারার

□□□□□□□□□□ □□□□□□, □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□-□□ □ □□□□□□□□-□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□, □□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □ □□□□□□□□□□ ‘□□□□□□□□ □□□□□□□□□’□

□□□□□: □□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□

□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□-□□□□□□ □□□□□

□□□□□□□□□ □□ ‘□□□□□□’ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□

□□ □□□□□□□ (□□ □□□□□□□□□□□□) □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□. □□. (□□.) □ □ □ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □ □□□ □□□□□□

□□□□□ □□□□□, □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□

□□□□□ □□ □□□□□, □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□, □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□, □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□, □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□, □□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□, □□□□□

প্রতিনিধি আমি নির্বাচিত করতে পারবে কি না- তার সব কিছু নির্ভর করছে আগামী কয়েকটা দিনের মধ্যে।
ফখরুল বলেন, আমার একটাই কথা … যারা সংগ্রাম করছেন, তাদের আরো বেশি করে শক্তিশালী হয়ে এই আন্দোলনকে, এই সংগ্রামকে রাজপথে বিস্তৃত করে দিয়ে সাধারণ মানুষকে নামিয়ে আনতে হবে।

সাধারণ মানুষকে যখন রাজপথে নামিয়ে আনতে পুরোপুরিভাবে সক্ষম হব, সেদিনই আমাদের বিজয় সুনিশ্চিত হবে।
মির্জা ফখরুল বলেন, ওরা (ক্ষমতাসীনরা) কতটা রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়া হয়ে গেছে… এখন দল ভাঙার চেষ্টা করে। দল কখন ভাঙতে যায়, যখন সে বোঝে দুর্বল। আজকে তারা (সরকার) আমাদের দলছুট, বহিষ্কৃত লোকজনকে নিয়ে আবার দল তৈরি করে ঝামেলা করতে চায়।

আমরা খুব পরিষ্কারভাবে বলছি, এগুলো করে কোনো লাভ হবে না। মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে। মানুষ একটা নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন চায় সব দলের অংশগ্রহণে। এর বিকল্প তারা কিছু চায় না।
আন্দোলন দমানো যাবে না উল্লেখ করে ফখরুল বলেন, আমরা রাজনৈতিক দল হিসেবে আমাদের যে দায়িত্ব সেই দায়িত্ব আমরা পালন করছি।

আমরা রাস্তায় নেমেছি, প্রায় এক বছর ধরে রাস্তায় নেমেছি, এর মধ্যে আমাদের ২২ জন তরুণ-যুবক নেতার প্রাণ গেছে রাস্তায় পুলিশের গুলিতে, আমাদের নামে অসংখ্য মামলা হয়েছে, আমাদের অসংখ্য নেতাকর্মী জেলে গেছে। তার পরেও আমাদেরকে কখনো দমিয়ে রাখতে পারছে না, পারবেও না। এখন আমাদের রোড মার্চ হচ্ছে, এতে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ হচ্ছে কি না আপনারা দেখেন। আমি নিজে একটা রোড মার্চে ছিলাম বগুড়া থেকে রাজশাহীতে… রাস্তার দুই ধারে অগণিত পুরুষ-মহিলা-নারী-শিশু, স্কুলের ছেলে-মেয়েরা স্কুল থেকে বেরিয়ে আসছে… তারা এই রোড মার্চকে স্বাগত জানাচ্ছে এবং এই সরকারের পতন চাচ্ছে।
সরকারের সমালোচনা করে মির্জা ফখরুল বলেন, ওরা দেশকে ভয়াবহ রাষ্ট্রে পরিণত করেছে। আলজাজিরা মিডিয়ার করেসপডেন্ট, তার সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল কয়েক দিন আগে। তিনি বলছেন যে আমি তো এখানে আছি, আসছি …কোনো দিন ভাবিনি যে বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যাব। এখন চিন্তা করতে শুরু করেছি যে বাংলাদেশে থাকব না। কেন?

তিনি বলেন, আমাদের বহু বুদ্ধিজীবী এখন টেলিভিশনের টক শোতে আসেন না। কারণ কী? তাদের ভয় দেখানো হয় যে আপনারা যদি গিয়ে সরকারের

বিরুদ্ধে কথা বলেন, তাহলে আপনাদের বিপদ হবে। বিপদের মধ্যে যে সবচেয়ে টাচি জায়গায় আঘাত করবে তারা। ছেলে-মেয়েরা যদি স্কুল-কলেজে পড়ে তাদের তুলে নিয়ে যাওয়া হয়, হুমকি দেওয়া হয় অদৃশ্য জায়গা থেকে… এই রাষ্ট্রে আমরা বাস করছি। আজকে দুর্ভাগ্যজনক হলো- আমরা যারা স্বাধীনতাযুদ্ধে জড়িত ছিলাম আমরা এটা ভাবতেও পারি না যে আমাদেরকে এখন গার্ডেডওয়েতে কথা বলতে হবে, আমাদের ভাবতে হয়- এখন কোথায় যাব, না যাব, কার বিয়েতে যাব, অনুষ্ঠানে যাব কি যাব না… এই বিষয়গুলো আমাদের নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

সংগঠনের সভাপতি গাজীপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ফজলুল হক মিলনের সভাপতিত্বে ও সদস্যসচিব মজিবুর রহমানের সঞ্চালনায় আলোচনাসভায় বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আলতাফ হোসেন চৌধুরী, যুগ্ম মহাসচিব খায়রুল কবির খোকন, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক সম্পাদক জয়নাল আবেদীন, সহসাংগঠনিক সম্পাদক বেনজির আহমেদ টিটু, শ্রমবিষয়ক সহসম্পাদক হুমায়ুন কবির খান, কৃষক দলের সহসভাপতি ওমর ফারুক শাফিন, প্রয়াত আ স ম হান্নান শাহর ছেলে জেলা সাধারণ সম্পাদক শাহ রিয়াজুল হান্নান, স্থানীয় নেতা খন্দকার আজিজুর রহমান পেরা, সাংবাদিক রাশেদুল হক বক্তব্য দেন।

সূত্র: কালের কণ্ঠ অনলাইন

নানামুখী চ্যালেঞ্জে জয়ী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মুক্তিযুদ্ধের পর মার্কিন নিরাপত্তা উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে বলেছিল ‘তলাবিহীন ঝুড়ি’। সেই বাংলাদেশ আজ বিশ্ব দরবারে উদীয়মান অর্থনীতির রোল মডেল। যাঁর নেতৃত্বে আজ বাংলাদেশের এই বিস্ময়কর উত্থান, তিনি বঙ্গবন্ধুকন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনা। শেখ হাসিনার পথচলার এ দীর্ঘ সময় কখনোই সহজ ছিল না। ২১ বার তাঁকে হত্যার চেষ্টা চালিয়েছে স্বাধীনতাবিরোধীরা। তাছাড়া নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে শক্ত হাতে পূর্ণ আত্মবিশ্বাসে আজও বাংলাদেশের

নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা।

১৯৭৫ সালের পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর দেশে ফেরাই ছিল শেখ হাসিনার জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। তৎকালীন স্বৈরশাসক জিয়াউর রহমান শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরতে বাধা দেয়। ফলে রাজনৈতিক আশ্রয়ে বাধ্য হয়ে ভারতে অবস্থান করেন শেখ হাসিনা। কিন্তু বাংলার মানুষের ভালোবাসায় তৈরি হয়েছে শেখ হাসিনার সাহসের পাটাতন। পরবর্তীতে সামরিক সরকারের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে তিনি ফিরে আসেন স্বদেশে। মুখোমুখি হন স্বৈরাশসকের।

১৯৭৭ সালে ভারত সফরের সময় জিয়াউর রহমান শেখ হাসিনাকে ভারতে আশ্রয় না দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন তৎকালীন ভারত সরকারকে। ভারতের প্রভাবশালী দৈনিক ইন্ডিয়ান টাইমসে এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন সে সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৭৫-৮১ ছয় বছর বিদেশে নির্বাসিত জীবন কাটিয়ে আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হয়ে অবশেষে ১৯৮১ সালের ১৭ মে সকল রক্তচক্ষুকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ জনতার উপস্থিতিতে শেখ হাসিনা বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখেন। শুরু করেন বাংলার মানুষের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার আন্দোলন।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছিল আওয়ামী লীগ। অনেকেই আওয়ামী লীগ ছেড়ে মোশতাকের মন্ত্রীসভায় যোগ দিয়েছিল সে সময়। সারাদেশে স্বৈরশাসক জিয়ার অত্যাচার নিপীড়নে ছন্নছাড়া হয়ে পড়েছিল আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। সে অবস্থা থেকে দলের পুনর্গঠনের দিকে মনোনিবেশ করেন শেখ হাসিনা। কয়েক বছরের মধ্যেই শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ আবার ঐক্যবদ্ধ এবং শক্তিশালী হয়ে ওঠে। শুরু হয় আওয়ামী লীগের পুনর্জাগরণ।

সামরিক শাসক জিয়াউর রহমানের পতনের পর শুরু হয় স্বৈরশাসক এরশাদের শাসনামল, চলে ১৯৮৩ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত। স্বৈরাশাসক হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ এসময় দেশের গণতন্ত্রের টুটি চেপে ধরে, পূর্ববর্তী সেনাশাসক জিয়ার মতই একচেটিয়া শাসনব্যবস্থায় দেশ পরিচালনা করতে থাকে। কিন্তু শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের মানুষকে সাথে নিয়ে তীব্র আন্দোলনের মুখে পিছু হটতে শুরু করে এরশাদ। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের নানামুখী আন্দোলনের মুখে পতন ঘটে স্বৈরাচার এরশাদের শাসনব্যবস্থা। পুনরুদ্ধার হয় গণতন্ত্রের। এজন্যই তাঁকে বলা হয় ‘গণতন্ত্রের মানসকন্যা’।

বাংলাদেশ জঙ্গিবাদের উত্থানের আলামত প্রথম স্পষ্ট হয় ১৯৯২ সালে

চেষ্টা করেছে সাম্প্রদায়িক অপগোষ্ঠী। রামু, নাসিরনগর, কুমিল্লা, রংপুরের সাম্প্রদায়িক আস্ফালন এর প্রকৃত উদাহরণ। কিন্তু শেখ হাসিনা শক্তহাতে এ সাম্প্রদায়িক আস্ফালন বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। আইনশৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনীসহ সর্বস্তরের সর্বধর্মের মানুষের সহায়তায় সাম্প্রদায়িকতা বন্ধের চেষ্টা করে যাচ্ছেন। প্রতিটি ঘটনায় দোষীদের বিচারের আওতায় এনে অসাম্প্রদায়িক চেতনার বাংলাদেশ গড়ার কাজ করে যাচ্ছেন নিরলসভাবে।

শুধু তাই নয়, করোনার কারণে বিশ্ব অর্থনীতি যখন ধুঁকছিল, তখনও বাংলাদেশ রেকর্ড ৫ দশমিক ২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছিল। প্রয়োজনীয় সময়ে লকডাউন ঘোষণা, জনসচেতনতা বৃদ্ধি, টিকা আমদানি ও তা সঠিকভাবে প্রয়োগ, করোনা যুদ্ধে ফ্রন্টলাইন যোদ্ধাদের জন্য পিপিই-মাস্কসহ স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী নিশ্চিত করা; টেস্টিং কিট আমদানি, দেশের বিভিন্ন স্থানে ল্যাব স্থাপন, স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শের জন্য ৩টি হটলাইন (১৬২৬৩; ৩৩৩ ও ১০৬৫৫) চালুসহ প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপই সঠিক সময়ে গ্রহণ করেছিলেন শেখ হাসিনা। তাঁর গৃহীত বাস্তবসম্মত নানা পদেক্ষপের কারণেই বাংলাদেশ করোনা মোকাবিলায় বিশ্বে অনন্য নজির সৃষ্টি করেছিল। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় শেখ হাসিনার নির্দেশনায় বর্তমানে ২২০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র, ৪২৩টি বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র, ৬৬টি ত্রাণ গুদাম, ২৬৯২ কি.মি. মাটির রাস্তা এইচবিবিকরণ, ৬৪৯১টি সেতু/কালভার্ট এবং ৫৫০টি মুজিব কিল্লা সংস্কার ও নির্মাণ করা হয়েছে ।

আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জ দক্ষতার সাথে সামলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ভারত ও মিয়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমা নিয়ে দীর্ঘদিন যাবত বাংলাদেশের বিরোধ ছিল। শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে কোনরকম রক্তপাত ছাড়াই সমুদ্রসীমা বিরোধ সমাধান করেন। একই সাথে ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ কিলোমিটার সমুদ্রসীমার ওপর সার্বভৌম অধিকার ছিনিয়ে আনেন। যা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপক প্রশংসিত হয়। চীন ও ভারতের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব থাকলেও শেখ হাসিনা অত্যন্ত চমৎকারভাবে দুই দেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রেখে চলছে। যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ভারত, জাপানসহ বিশ্বের প্রভাবশালী দেশগুলোর আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু এখন ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল। শেখ হাসিনার কূটনৈতিক সফলতায় বাংলাদেশ এখন ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছে।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা

বিশ্ব যখন নিষেধাজ্ঞাসহ দেশের সংবিধান পরিপন্থী নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার পাঁয়তারা করছে, শেখ হাসিনা তখন দেশের সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন পরিচালনা করার দৃঢ় অবস্থান ব্যক্ত করে যাচ্ছেন। কোন অবস্থাতেই পশ্চিমা বিশ্ব শেখ হাসিনার এই গণতান্ত্রিক নির্বাচনের অবস্থান থেকে টলাতে পারছে না। ফলে ভূ-রাজনীতির সমীকরণে শেখ হাসিনাকে বিগ ফেক্টর হিসেবে গণ্য করছে বিশ্বনেতারা।

কোন সার্বভৌম রাষ্ট্রের ওপর কেউ নিষেধাজ্ঞা দিতে পারে না

বাংলাদেশের নির্বাচন ‘অবাধ ও সুষ্ঠু’ করার লক্ষ্যে কেউ যেন বিঘ্ন সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র ভিসানীতির আওতায় ফেলেছে বাংলাদেশকে। যদি এমন কেউ ভিসার জন্য আবেদন করে যিনি বাংলাদেশের নির্বাচনকে বাধাগ্রস্থ করতে চায় বলে প্রমাণিত হয়, তবে তিনি ভিসা নাও পেতে পারেন।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের ভালোর জন্য এই উদ্যোগ নিয়েছে। তবে একথা না বলে উপায় থাকে না যে-যুক্তরাষ্ট্র অন্যদেশের স্বার্থ সংরক্ষণ করে এমন আমার জানা নেই। তারা যেকোন সিদ্ধান্ত নেয় নিজের স্বার্থ রক্ষায়। এই প্রক্রিয়ায় তাদের অন্যতম একটি অস্ত্র হলো ‘স্যাংশন’। যেকোন উদ্ভুত পরিস্থিতিতে কোন দেশকে শাস্তি দিতে হলে, বা যুক্তরাষ্ট্র কাউকে শাস্তি দেবে মনে করলে তখন এই অস্ত্র প্রয়োগ করে।

প্রশ্ন হলো, এইটা কোন রাষ্ট্র কখন পারে? বা আদৌ তারা কীভাবে পারে? একক কোন দেশ, অন্য কোন সার্বভৌম দেশের ওপর স্যাংশন দেয়া আইনভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থার বিরুদ্ধে কাজ করে। তথাকথিত চিন্তা হলো- বিশ্বের সব দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে একটি সংস্থা কাজ করে। সেটি হলো জাতিসংঘ। তাকে পাশ কাটিয়ে কোন একটা দেশ অপর দেশের ওপর যখন তাদের ইচ্ছা চাপিয়ে দিতে চায়, তখন সে তার অস্ত্র হিসেবে স্যাংশনকে ব্যবহার করে। যুক্তরাষ্ট্র যখন সেই সিদ্ধান্ত নিতে চায় তখন সে খেয়াল করে ওই দেশের সঙ্গে মেজরিটি কান্ট্রি আছে

কিনা? সেসব বিচার করে আমেরিকা সিদ্ধান্ত নেয়।

আমি মনে করি, বর্তমানে স্যংশনের নামে যেটা ব্যবহার করা হচ্ছে, সেটা আসলে জনগনকে শাস্তি দিচ্ছে। বাংলাদেশের সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে আপনি স্যাংশন আরোপের কথা বলছেন বা বাস্তবায়ন করছেন ঠিকই, কিন্তু আসলে সেটা যখন করছেন তখন এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে কস্ট দেওয়া হচ্ছে। ভুলে গেলে চলবে না, বাংলাদেশের মানুষের কস্টে থাকার অভিজ্ঞতা আছে। আর এই দেশের মানুষের এও জানা আছে যে, ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে যে স্বাধীনতা অর্জন করেছিলো তা আমেরিকার ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

আমেরিকা আসলে কেন এমন পরিস্থিতি তৈরী করলো? এবার একটু পিছনের দিকে ফিরতে হবে। মুক্তিযুদ্ধে তারা বাংলাদেশের পক্ষ নেয়নি। শুধু তাই নয়, একটি যুদ্ধোত্তর দেশকে সামনে এগোতে নানা বাধা সৃষ্টি করেছিল। নিজের স্বাধীন দেশের জন্যে, বঙ্গবন্ধু যখন কিউবাতে গিয়ে তাঁর চটের বস্তা নিয়ে কাজ করতে চাইলেন তখন আমেরিকা বাধ সেধেছিলো। সেসময় তারা খাদ্য অনুদান দিতো, সেটি বন্ধ করে দেয়ায় বাংলাদেশে চরম খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়। অনুদান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সেই মুহূর্তে খাদ্য ঘাটতি পূরণ করতে না পারায় খাদ্য সংকটে পড়েছিলো এই দেশ। সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়েছিল শ্রমজীবী মানুষ। লেখার শুরুতে যেটা বলছিলাম, আসলে শাস্তিটা পায় সাধারণ মানুষ।

অন্যান্য দেশের উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। ভেনেজুয়েলাতে তাদের স্যাংশনের কারণে ৪০ হাজার শিশু মারা গিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর একক সিদ্ধান্তে মারা গেলো ৪০ হাজার শিশু! এমন পরিস্থিতি যখন শুধু একটি দেশের ইচ্ছায় হয়, তখন কোন সম্মিলিত বিশ্বব্যবস্থা তা মানতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে এই স্যাংশন অস্ত্র যেভাবে কাজে লাগাতে চাইছে, সেটা আগামীদিনে কতটা কাজে লাগবে তা নিয়ে আমার শঙ্কা রয়েছে। কারণ স্যাংশনে পড়া অনেক দেশ সেটা ভেঙে ফেলতে চাইছে। যেমন ধরা যাক, ইউক্রেনের জন্য রাশিয়াকে যে স্যংশন তারা দিয়েছে, তা কি রাশিয়া মানছে? কিংবা ধরা যাক, উগান্ডা কিংবা নাইজেরিয়ার কথা।

ঠিক একইভাবে, বাংলাদেশে তারা এখন অবাধ সুস্ঠু নির্বাচনের কারণ দেখিয়ে স্যংশনের হুমকি দিল। প্রশ্ন হলো, তারা ‘অবাধ ও সুষ্ঠু’ নির্বাচনের কথা বলছে বটে, কিন্তু অবাধ পরিবেশ তৈরী করছে কি? বরং দেখা যাচ্ছে, যারা আমেরিকার ইচ্ছের বিরুদ্ধে যাচ্ছে, তাদের বশে আনার উপায় হিসেবে স্যাংশন দিচ্ছে। তারা কার ওপর হুমকি দেবে, সেটা

নিশ্চিত বোঝা কঠিন হয়ে যাচ্ছে কারণ, নির্বাচনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমন অনেকের ভিসাও যে আমেরিকা দেয়নি সেই উদাহরণও আছে।

আরেকটি অমীমাংসিত প্রশ্ন হলো, কারা কী করছে যুক্তরাষ্ট্র কোথা থেকে সে তথ্য নিচ্ছে? সেই তথ্য একপেশে, না গ্রহণযোগ্য সেই বিবেচনা কে করবে? একজন তথাকথিত মানবাধিকারকর্মী আদিদুলের আইনের পথে বিচার হলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের মাথা ব্যাথার কারণ হয় এবং তার পক্ষে সরব অবস্থান নেয়। কিন্তু সেই লোক যে ৬১ লাশের কথা বলে মিথ্যাচার করলো এবং সেই মিথ্যাচার যে একটা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরী করলো, অরাজকতার চেষ্টা হলো, সেটা উল্লেখ না করে, বিবেচনায় না নিয়ে, প্রকারন্তরে সমর্থন দিলো! সেই বিষয়টা অন্ধকারে রেখেই কী বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি মূল্যায়ন হবে?

আসলে খোদ যুক্তরাষ্ট্র দেখতে পাচ্ছে যে এই স্যাংশন নিয়ে রাশিয়া, ইরান, উত্তর কোরিয়া ভাল আছে। মার্কিন নিয়ন্ত্রিত যে অর্থব্যবস্থা, তার বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত গড়ে উঠতে শুরু করেছে। ফলে এধরনের অস্ত্রের ব্যবহার, মার্কিনবিরোধী জোট তৈরীতে সহায়ক হবে। এই বোধ আমেরিকার থাকতে হবে। যদিও এ নিয়ে আমি তাদের উপদেশ দিতে চাই না। শুধু বলতে চাই, একপেশে তথ্যের ওপর ভিত্তি করে, কোন বিশেষ গোষ্ঠীকে সুবিধা দেবার জন্য স্যাংশনের মত কোন উদ্যোগ গ্রহণযোগ্য না। বাংলাদেশের জন্যে ভিসানীতি ঘোষণার পর দেখা গেছে, একপক্ষ আনন্দ নিয়ে উগ্রীব হয়ে আছে। এতেই বোঝা যায় এটি একটি রাজনীতি বিভাজন প্রক্রিয়া। যে কারণে এক পক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে জেনে খুশি হয়ে যাচ্ছে অন্যপক্ষ।

সেটা কি অবাধ নিরপেক্ষ পরিস্থিতি সৃষ্টিতে সহায়ক? এই পরিস্থিতি সংঘাতের কারণ হতে পারে। সেই দায় কে নেবে? ভুলে গেলে চলবে না যে, আরেক দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার কারণে কোন সংঘাত হলে, এর দায় তাদের নিতে হবে। স্যাংশন বিষয়ে ঘোষণা আসার পরে বাংলাদেশে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত পিটার হাস আবার সুনির্দিষ্ট করে বলছেন, এরমধ্যে গণমাধ্যমও পড়বে। আবার এরপর স্টেট ডিপার্টমেন্ট বলছে, গণমাধ্যম পড়বে এমনটা এখনও না। এ ধরনের আলাপ তোলা, কোন রাষ্ট্রদূতের জন্যে কতটা কূটনৈতিক শিষ্টাচার? এই প্রশ্ন আমরা এখন তুলতেই পারি। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কথা বলার এখতিয়ার বিদেশি রাষ্ট্রের নেই। কিন্তু তারপরেও তারা এটা করছে, কেনো? এক কথায় এর জবাব হতে পারে, তারা এটা করছে শক্তি দেখানোর জন্যে।

তাদের শক্তি দেখানোর আরও একটি উদাহরণ আছে। সেটা হচ্ছে, পিটার

হাস আরও বলেছেন, তারা বাংলাদেশের বিচার বিভাগ পযবেক্ষণ করবে। কী অদ্ভুত! তারা কি জানে না, বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা স্বাধীন? আপনি বিচারককে কীভাবে পযবেক্ষণ করবেন? তিনিতো কাজ করেন আইনের বিধিতে। বাংলাদেশ চলবে বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র বা সংবিধানে। আমেরিকার নিয়মে তো চলবে না। পর্যবেক্ষণের মতো বিষয়গুলো সামনে এনে এরা এসব প্রতিষ্ঠানে রিতীমত বিব্রতকর পরিস্থিতি তৈরী করতে চাচ্ছে।

এখন আমাদের অবস্থান কী হবে, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং সে অনুযায়ী অ্যাক্ট করা দরকার। সত্যিকথা বলতে, আমেরিকা মনে করে ভারত মহাসাগরে তার অবস্থান শক্ত করতে হলে বাংলাদেশকে তার লাগবে। কিন্তু বাংলাদেশের বৈদেশিক সম্পর্ক ভারসাম্যপূর্ণ, পররাষ্ট্রনীতি অনুযায়ী সে সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব রক্ষার কথা বলে। এখন সেটা ভাঙতে চাইলে বাংলাদেশকে নানারকম চাপ দেয়ার বিকল্প নেই। এখন এই অবস্থা বিবেচনা করে করণীয় ঠিক করাটা বাংলাদেশের জন্যে জরুরি।

লেখক: নিরাপত্তা বিশ্লেষক।

ভিসানীতি: বিএনপিকে নির্বাচনে আসতেই হচ্ছে

লেখাটি শুরু করি ২০১৪-২০১৫ সাল থেকে। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি দশম জাতীয় নির্বাচন ঠেকানোর নামে বিএনপি-জামায়াত জোট দেশময় তাণ্ডব করেছিল। গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, নির্বাচনের আগে পরের সেই তাণ্ডবে মারা গিয়েছিল ২৩১ জন নিরীহ মানুষ। এদের মধ্যে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল ১৬৫জনকে। ওই সময় আহত হয়েছিল ১ হাজার ১৮০ জন। যাদের অনেকে আজও শরীরে ক্ষতচিহ্ন বয়ে বেড়াচ্ছেন। সেসময় ২ হাজার ৯০৩টি গাড়ি, ১৮টি ট্রেন ও ৮টি লঞ্চে আগুন দিয়েছিল বিএনপি-জামায়াত জোট।

কারণ কী ছিল সেই সহিংসতার? সরকার বলছিল নির্বাচন হবে পৃথিবীর আর ১০টা গণতান্ত্রিক দেশের মত। আর বিএনপি জোটের দাবি ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন। এখনও সরকারে আছে আওয়ামী লীগ এবং নির্বাচন নিয়ে তাদের দর্শন থেকে সরে আসেনি। তত্ত্ববধায়ক

সরকারের দাবি থেকে সরে আসেনি বিএনপি-জামায়াত। নির্বাচন নিরপেক্ষ হবে না ঘোষণা দিয়ে সব নির্বাচন থেকে দূরে রয়েছে তারা।

ঠিক এই মুহূর্তে রাজনীতিবিদ এবং সরকারি কর্মকর্তাসহ বাংলাদেশি কিছু নাগরিকের বিরুদ্ধে মার্কিন ভিসা নিষেধাজ্ঞার সিদ্ধান্ত জারি করলেন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেনের বরাত দিয়ে তিনি বললেন, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচনে বাধা দেয়ায় বাংলাদেশি কিছু নাগরিকের বিরুদ্ধে ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কারও নাম না উল্লেখ করে তিনি বললেন, যাদের উপর নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে তারা বাংলাদেশের বর্তমান ও সাবেক সরকারি কর্মকর্তা, ক্ষমতাসীন ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্য, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, বিচারবিভাগের সদস্য এবং নিরাপত্তা সংস্থার সদস্য।

যাদের উপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেয়া হচ্ছে সেসব ব্যক্তি তা তাদের পরিবারের সদস্যরা হয়তো যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না। ভবিষ্যতে আরও কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচনী প্রক্রিয়া ক্ষুণ্ন করা বা এর সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ পাওয়া গেলে তারাও এই নীতির আওতায় আসবেন। এই পদক্ষেপ বাংলাদেশে শান্তিপূর্ণভাবে অবাধ ও সুষ্ঠ জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের সমর্থক।

এর আগে চলতি বছরের ২৫শে মে বাংলাদেশের জন্য নতুন ভিসা নীতির ঘোষণা দিয়েছিলো যুক্তরাষ্ট্র। তখন বলা হয়েছিলো যে, এই নীতির আওতায় যে কোন বাংলাদেশি যদি গণতান্ত্রিক নির্বাচনের প্রক্রিয়া ব্যাহত করার জন্য দায়ী হন বা এরকম চেষ্টা করেছেন বলে চিহ্নিত হন। তাহলে যুক্তরাষ্ট্র তাকে ভিসা দেয়ার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারবে।

এই বিধিনিষেধ ঘোষণার পর থেকে নানামুখি প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে নানা মতের মানুষ। এই মুহূর্তে আমেরিকা সফররত খোদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ভিসা নীতি নিয়ে ভয়ের কিছু নেই। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আওয়ামী লীগেরও চাওয়া। তবে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যদি বাংলাদেশের বাইরে থেকে নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করে, সে ক্ষেত্রে এ দেশের জনগণ ওই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রতিও নিষেধাজ্ঞা দেবে। তিনি বলেন, ‘মার্কিন ভিসানীতি প্রয়োগের ঘোষণায় বিরোধীদের কথাও বলা হয়েছে। এবার বিএনপি জ্বালাও-পোড়াও করতে পারবে না। এতে জনগণের জীবন বাঁচবে।’

ভিসানীতি নিয়ে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিভিন্ন গণমাধ্যমে বলেছেন, মার্কিন নিষেধাজ্ঞার প্রয়োগ শুরু হয়েছে মাত্র। বর্তমান সরকার জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হয়নি। এই সরকার ২০১৪ ও ২০১৮ সালে জনগণকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে, নিজেরা নিজেদেরকে নির্বাচিত ঘোষণা করেছেন। এবার ২০২৪ সালে যে নির্বাচন হতে যাচ্ছে, তারা একইভাবে নির্বাচন করতে চাচ্ছেন। সরকারের লক্ষ্য বিরোধীদলকে বাদ দিয়ে আবারও একটি নির্বাচন করা। বর্তমান সরকার যদি ক্ষমতায় থেকে নির্বাচন দেয়, সেই নির্বাচন কখনও সুষ্ঠু হতে পারে না এবং সেটা কখনোই দেশের মানুষ মেনে নেবে না।”

যুক্তরাষ্টের নতুন ভিসা নীতির নিষেধাজ্ঞার তালিকায় কিছু বিরোধী দলের নেতার নাম আছে। এ নিয়ে জানতে চাইলে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, গত ১৮ বছর ধরে বিরোধী দলের তো কোন ভূমিকা নেই, তারা এমন কোন কাজ করেনি, যে কাজের জন্য একটা সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন বাধাগ্রস্ত হবে। যেহেতু বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রের বাইডেন সরকার গণতন্ত্রকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছেন। তারা বারবার বলছেন বাংলাদেশে অবাধ সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হতে হবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কী হলে গণতন্ত্র সুষ্ঠু হয়? আজকের নিষেধাজ্ঞাদাতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন পদ্ধতি কী? তারা কী তত্ত্বাবধায়ক সরকার মানেন? এখানে আরেক দফায় মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ঘোষণায় আসতে হচ্ছে। তিনি বলেছিলেন, বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচনে বাধা দিলে ভিসা দেবে না যুক্তরাষ্ট্র। এই ঘোষণাটি তিনি দিয়েছিলেন, গত মে মাসের ৩ তারিখে বাংলাদেশ সরকারকে এই ভিসা নীতি আরোপ করার সিদ্ধান্ত জাননোর পর।

আরেকটু সরল করে যদি জিজ্ঞেস করি কেন ২০১৪ এবং ২০১৮ সালের নির্বাচন কেন অংশগ্রহণমূলক হলো না? এর দায় কী শুধু সরকারের? নির্বাচন করা তো সাংবিধানিক দায়িত্ব। সরকার সেই দায়িত্ব পালন করেছে। ২০০৮ সালে জনগণ আওয়ামী লীগকে সংবিধান রক্ষার ম্যান্ডেট দিয়েছিল। ভাঙার দায়িত্ব তো দেয়নি। সেই সময় থেকে বিএনপি-জামায়াত গো ধরেছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের। তত্ত্বাবধায়ক সরকারতো কোন স্বীকৃত নির্বাচন ব্যবস্থা নয়। পৃথিবীর কোথাও তো এই পদ্ধতি জনপ্রিয় হয়নি।

নির্বাচনে বাধা দেয়ার প্রশ্ন যদি ওঠে, সেই কাজটি করেছে বিএনপি-জামায়াত। তারা নির্বাচনে আসেনি। দেশময় জ্বালাও পোড়াও করে

মানুষের মধ্যে নির্বাচন ভীতি সৃষ্টি করেছে। যে ভীতি আজও কাজ করে মানুষের মধ্যে। সেসব নিয়ে আজকাল কথা বার্তা কম হয়। কিন্তু প্রশ্ন আসা উচিত ছিল, কেন বন্ধকী গণতন্ত্র জিইয়ে রাখতে চেয়েছিল বিএনপি-জামায়াত? কেন তারা সুষ্ঠু গণতেন্ত্রে ফিরতে চায় না? কেন তারা ২০০৪ সালের ২১শে আগস্টে শেখ হাসিনাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করতে চেয়েছিল? চক্রটি চেনার পরেও শেখ হাসিনা কী বার বার তাঁকে হত্যার অস্ত্র হত্যাকারীদের হাতে তুলে দেবে?

যাই হোক, আগামী নির্বাচন এবং নতুন ভিসা নীতির কাছে ফিরে আসি। বিএনপি-জামায়াতের প্রিয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কথা কোথাও বলেননি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বার বার বলেছেন, একটি অংশগ্রনমূলক নির্বাচনের কথা। বিএনপি নির্বাচনে আসলেই তো নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হয়। সেটা সুষ্ঠু করার দায়তো সরকারের। সেই প্রতিশ্রুতিতো সরকার বার বার দিচ্ছে। নির্বাচনে কী হবে? সুষ্ঠু হবে কী না সেটা নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত তো মন্তব্য করা যাবে না। কারো বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের উপরতো একটি সংবিধান বা রাষ্ট্র ভর করতে পারে না। যত শক্তিধরই হোক যুক্তরাষ্ট্রতো বাংলাদেশকে সংবিধান ভাঙার পরামর্শ দিতে পারে না নৈতিকভাবে।

ভিসানীতি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র নির্বাচন কেমন হচ্ছে তা দেখার দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে। এখন বিএনপির ভয় পাওয়ার কিছু দেখছি না। আসলে ভিসানীতি দিয়ে নির্বাচনের বল বিএনপির কোটে ঠেলে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এখন নির্বাচেনে আসা তাদের দায়িত্ব। এর পরেও যদি তারা না আসে তাহলে ব্লিংকেনের ‘গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়া দুর্বল’ করার অপরাধে পড়বে বিএনপি। ফখরুল সাহেবরা নিশ্চয়ই আর সেই অপরাধ করবেন না।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

গণমাধ্যমের ওপর ভিসা

নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে হাসের কথায় ভিন্নমত যুক্তরাষ্ট্রের

বাংলাদেশি গণমাধ্যমকর্মীদের ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের কথায় ভিন্নমত জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর। যুক্তরাষ্ট্রের ভিসানীতিতে বাংলাদেশি গণমাধ্যমকর্মীদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে জানিয়েছিলেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত। এরপরই গণমাধ্যম নেতা ও বিশ্লেষকরা তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। আর একদিন পরেই পিটার হাসের বক্তব্যের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেছে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর বা ডিপার্টমেন্ট অব স্টেট। তারা জানিয়েছে, এই নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র রাজনৈতিক দল, বিরোধী দল ও ব্যক্তিত্ব এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর প্রযোজ্য।

গত সোমবার (২৫ সেপ্টেম্বর) পররাষ্ট্র দপ্তরের নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার স্পষ্ট করে বলেন, ‘গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব নয়, বরং বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী দলের সদস্যদের ওপরই ভিসানীতি কার্যকর হয়েছে।’

গত ২৪ সেপ্টেম্বর একটি বেসরকারি চ্যানেলের কার্যালয়ে এসে সাক্ষাৎকারে ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বলেন, সরকারি দল, বিরোধী দল ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পর আগামীতে গণমাধ্যমও ভিসানীতিতে যুক্ত হবে। পিটার হাসের এই বক্তব্যের দুইদিন আগে শুক্রবার (২২ সেপ্টেম্বর) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট এক বিবৃতিতে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়া যারা বাধাগ্রস্ত করবে তাদের ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপের কথা জানায়।

এর আগে, গত ২৪ মে বাংলাদেশের জন্য নতুন ভিসানীতি ঘোষণা করে যুক্তরাষ্ট্র। এতে বলা হয়, বাংলাদেশে কেউ গণতান্ত্রিক নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় বাধা দিলে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা পাবেন না। এমনকি তার পরিবারের সদস্যরাও মার্কিন ভিসা থেকে বঞ্চিত হবেন। কিন্তু গণমাধ্যমের কথা আলাদাভাবে কখনো উল্লেখ করা হয়নি। পিটার হাস হঠাৎ করে কোন পরিপ্রেক্ষিতে গণমাধ্যমকে যুক্ত করে বক্তব্য দিলেন সেটি এখন প্রধান আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও দৈনিক ভোরের কাগজের সম্পাদক শ্যামল দত্ত বলেন, “যুক্তরাষ্ট্র যদি মিডিয়ার বিষয়ে এরকম কোনো সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে সেটা হবে দুঃখজন্ক এবং স্বাধীন গণমাধ্যমের উপর হস্তক্ষেপ।”বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের মহাসচিব দীপ আজাদ বলেন, “ভিসানীতি যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়। সেটা আরেকটি দেশের গণমাধ্যমের ওপর আরোপ করার সুযোগ থাকবে কেনো?“

গত সোমবার মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে বিষয়টি উত্থাপন করেন দেশের এক বেসরকারি টেলিভিশনের ওয়াশিংটন প্রতিনিধি। এ সময় রাষ্ট্রদূত যা বলেছেন, তার সঙ্গে ভিন্নমত প্রকাশ করেন মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার। তিনি বলেন, ভিসা নীতির আওতায় কারা পড়েছেন নির্দিষ্ট করে তাদের নাম প্রকাশ করা হয়নি। তবে এটি বেশ স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে, এর আওতায় পড়বেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী দলের সদস্যরা।

বাংলাদেশে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্যই ভিসা নীতি ঘোষণা করা হয়েছে বলে জানান মিলার। তিনি বলেন, বাংলাদেশের নির্বাচনে কোনো পক্ষ নেওয়ার জন্য ভিসা নীতি ঘোষণা করা হয়নি। বরং একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতেই এ ভিসা নীতি।